আধিব্যাধি অমনিবাস

১ম খণ্ড

শ্রীকুমার রায়

সম্পাদনা

অনুরাধা রায়

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সুচিপত্র

সম্পাদকের কথা ৭

আধিব্যাধির আদ্যকথা

নিবেদন ১৫
উপাদান ও ছবির উৎস ১৬
প্রথম পরিচ্ছেদ: আধিব্যাধির আদ্যকথা ১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হাতুড়ে বদ্যি ৪১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শল্যচিকিৎসা ৫৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যুদ্ধের আশীর্বাদ (!) ৯৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ভেষজ চিকিৎসা ১১২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: জনস্বাস্থ্য ১২৬

পেশাগত ব্যাধি

নিবেদন ১৪৭
গ্রন্থপঞ্জি ১৪৯
ভূমিকা ১৫১
ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১৬১
ভৌত পরিবেশের জন্য পেশাগত ব্যাধি ১৭৩-১৯২
তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ সংক্রান্ত ব্যাধি ১৭৩
অন্যান্য ভৌত কারণে পেশাগত ব্যাধি ১৮৪
রাসায়নিক শিল্পসংক্রান্ত পেশাগত ব্যাধি ১৯৩-২০৯
ধাতু ও ধাতু যৌগের কুফল ১৯৩

বিষাক্ত গ্যাস সংক্রান্ত পেশাগত ব্যাধি ১৯৯
সংশ্লেষিত রাসায়নিক শিল্পে পেশাগত ব্যাধি ২০৬
পেশাগত ক্যান্সার ২১০
পেশাগত চর্মরোগ ২২২
পেশাগত অপঘাত ২২৫
পেশাগত ইনফেকশন ২৩০-২৩৫
চাষ-আবাদ সংশ্লিষ্ট ইনফেকশন ২৩০
পশুপালন পেশায় ইনফেকশন ২৩২
ডাক্তার ও নার্সের পেশায় ইনফেকশন ২৩৫
পেশাগত ফুসফুসের ব্যাধি ২৩৬-২৪৮
নিউমোকোনিয়োসিস্ ২৩৬
ফুসফুসের পেশাগত অ্যলার্জি ২৪৭
অনায়াসসাধ্য পেশার কুফল ২৪৯
পেশা, মন ও মনোব্যাধি ২৫৫
পরিশিষ্ট ২৬৩-২৬৮
ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইন ২৬৩
পরিভাষা ২৬৬
বিশেষ সংযোজন
একজন ডাক্তারকে স্মরণ, এক সংগ্রামকে পুনরুদ্ধার/নব দত্ত ২৬৯
নির্ঘণ্ট:
আধিব্যাধির আদ্যকথা ২৭৭
পেশাগত ব্যাধি ২৯৩

সম্পাদকের কথা

১৯৮০-র দশকে কলকাতার এক ডাক্তারবাবু। খুব ব্যস্ত, একাধিক দাতব্য হাসপাতালে যুক্ত, ছোটো বড় নার্সিংহোমে সদা ছুটোছুটি, নিজের চেম্বার তো আছেই। এসবের ফলে চিকিৎসক হিসেবে অভিজ্ঞতা যত বাড়ছিল ততই মনে হচ্ছিল মানুষের সচেতনতা ছাড়া একটা ভাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা দাঁড়াতে পারে না। রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ বেশি কাম্য, শুধু ব্যক্তিস্তরে নয়, সামূহিক স্তরেও অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের দিক থেকেও। কিন্তু আধিব্যাধি সম্পর্কে মানুষের চিন্তা যে বরাবরই নানা যুক্তিহীন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, চিকিৎসা সম্পর্কেও তা-ই। ক্ষমতাশালী ও স্বার্থসন্ধানী মানুষদের আওতাতেও থাকতে হয় চিকিৎসাব্যবস্থাকে। 'সভ্যতা'র অগ্রগতি ব্যাপারটাই তো অনেকদূর পর্যন্ত জড়িয়ে জনস্বাস্থ্যের উপেক্ষা ও ক্ষতির সঙ্গে, কিন্তু 'সভ্যতাকে তো তাবলে বাদও দেওয়া যাবে না। আবার চিকিৎসাশাস্ত্রের নিজের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যে সীমাবদ্ধতার মোকাবিলা করতে করতেই সেই কোন্ আদ্যিকাল থেকে এগিয়েছে শাস্ত্রটি। সাধারণ মানুষের কিন্তু এসব একটু বোঝা দরকার, কেননা এ তো তার নিজেরই বাঁচা-মরার ব্যাপার। তার জন্য আবার বোঝা দরকার চিকিৎসার ইতিহাস থেকে শুরু করে, নিজেদের দৈনন্দিন আর পেশাগত জীবনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সব সম্ভাব্য সমস্যা, সর্বোপরি নিজের শরীরের মূল কাণ্ডকারখানাগুলো; কারণ সেসবের জানা-বোঝা, পরীক্ষানিরীক্ষা আর সমস্যার সমাধানই তো চিকিৎসা। রোগ আর চিকিৎসা দুটোকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বুঝে নেওয়া জরুরি। এটুকু বিজ্ঞান না বুঝলে চলবে কেন! সহজ করে বোঝালে বুঝবে বই কি! এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তারবাবু পরপর চারটি বই লেখেন সেই সময়ে। পেশাগত কাজের ফাঁকে, রাত জেগে, নিজের স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি করে।

বর্তমান খণ্ডে তারমধ্যে দুটি বই সংকলিত হল, *আধিব্যাধির আদ্যকথা*, যা মানুষের অসুখবিসুখ মোকাবিলার তথা চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস; আর *পেশাগত ব্যাধি*, নামেই যার বিষয়বস্তুর পরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আরো দুটি বই—*রোগ থেকে দূরে* (*স* পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি লেখার সংকলন) এবং *রোগনির্ণয় পদ্ধতি*। অস্থিবিদ্যা নিয়ে দুটি বাংলা বই লিখেছিলেন, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কিন্তু এ দু'টি চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র ও বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা। তাই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হল না।

তখনও ডাক্তারি ব্যাপারটা ইন্ডাস্ট্রি তথা মুনাফালোভী ব্যবসায়ে পরিণত হয় নি, ডাক্তারদের সেই বিপুল যন্ত্রের নাটবল্টু বানিয়ে। রোগীর জন্য ডাক্তারের সহমর্মিতা, সময় ও ধৈর্য খুব বিরল ছিল না। ডাক্তারের সঙ্গে রোগীদের মানবিক সম্পর্ক তৈরি হত। এই বইগুলি একজন সমাজসচেতন দরদি ডাক্তারের মনের প্রাণের তাগিদের ফসল। নিজের পেশার বাইরেও নিজেকে প্রয়োগ করা বৃহত্তর

সামাজিক উদ্দেশ্যে, নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। তার সঙ্গে অবশ্যই ছিল নিবিষ্ট পড়াশোনার পটভূমি। চিকিৎসাশাস্ত্রের নিবিড় অধ্যয়ন তো বটেই, তাছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অবাধ বিচরণ। 'সাংস্কৃতিক দ্বিখণ্ডন'-এর; মানে বিজ্ঞান আর মানববিদ্যার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান আমরা বরাবরই দেখে এসেছি - এধরনের মানুষ ছিলেন তার ঊর্ধ্বে, যাঁদের 'রেনেসাঁস ম্যান' বলা যায়, যাঁদের সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মাণ। চিকিৎসাবিদ্যায় পারঙ্গমতার জন্য পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা তো আবশ্যিক; কিন্তু শুধু তাই নয়, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য সব কিছু। বাংলা সাহিত্য, তৎসহ ইংরিজি, সংস্কৃত। সমগ্র বিশ্বের সব জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বৈভবের ওপরেই এই ডাক্তারবাবুর দাবি। আর সেই জ্ঞানের ভার কত সহজে বহন করতেন, যেন কত হালকা! বইগুলিতে তার পরিচয় আছে।

আরও লক্ষণীয়, দেশপ্রেম তো ছিলই (প্রসঙ্গত, এই ডাক্তারটি একদা বিদেশে কাজ করার ভালো সুযোগ উপেক্ষা করে ফিরে এসেছিলেন দেশের মানুষের কাজে লাগবেন বলে), কিন্তু তা বিশ্বজনীনতার পথে, সর্বজনীন মানবতার পথে প্রতিবন্ধক ছিল না। একজন ডাক্তারকে তো সব দেশ, জাতি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে হয়। মানুষ যে সর্বত্র খুব একইরকম, অথচ সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাও তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, এই সত্যটা চিকিৎসকের মর্মস্থলে থাকতেই হয়। চিকিৎসার ইতিহাস জুড়েও এই সত্যের প্রকাশ, যা *আধিব্যাধির আদ্যকথা*-তে তো বটেই, অন্য বইগুলিতেও কমবেশি বিধৃত। এটা ঠিকই, তাঁর অধীত চিকিৎসাবিদ্যা প্রধানত পাশ্চাত্য থেকেই আহৃত আর সেটাই তো চিকিৎসাবিদ্যার স্বীকৃত মূলধারা, তাই পাশ্চাত্যের ওজন বইগুলিতে একটু বেশিই মনে হয়। কিন্তু ভারত সহ মিশর, জাপান, চিন, ইসলামি ইত্যাদি নানান সভ্যতা সগৌরবে স্থান পায় সেখানে। কোথাও বা চলে আসে কোনো আদিবাসী সমাজের প্রসঙ্গ। যেখানে কোনো সাহেবের বইয়ের উদ্ধৃতিতে ভারতবাসীকে 'হিন্দু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, লেখক নোট দিয়ে দেন, 'ভারতবাসীকে হিন্দু নামে অভিহিত করাটা ইংরিজি ভাষায় বহুলপ্রচলিত বিভ্রম'। পুরাতনকে তারিফ করা আছে, তা থেকে প্রেরণা গ্রহণ আছে, কিন্তু নির্বিচারে নয়। পুরাতনকে কঠিন প্রশ্নও করেছেন।

ইতিহাস নিয়ে লেখকের বিশেষ আগ্রহ ভুল করার নয়। *আধিব্যাধির আদ্যকথা* তো প্রধানত সেই আগ্রহেরই ফসল, *পেশাগত ব্যাধি*তেও তা অনেকটা পরিস্ফুট। এ কিন্তু নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির প্রয়াস নয়, আজকের দিনে রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের প্রক্রিয়া তার সব শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সহ কিভাবে অতীতের গর্ভ থেকে উৎসারিত তা বোঝার চেষ্টা, যাতে আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও আরেকটু গভীরে গিয়ে বোঝা যায়। শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতিও যদি ধরি, বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসই তো তার সব ভ্রান্তি আর প্রয়াস নিয়ে সেই অগ্রগতি সম্ভব করে। কিন্তু বিজ্ঞানবিমুখ মানুষকে এই প্রবহমান প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানের দিকটুকুই শুধু বোঝানো যথেষ্ট নয়। চিকিৎসাবিদ্যা তো প্রায়োগিক বিজ্ঞান, আর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও সেখানে শুধু বৈজ্ঞানিক মেধা নয়, মানবমন তথা সমাজমানসও খুব বড় ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞান এবং সমাজের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে যে চিকিৎসাবিদ্যা, তার অতীতের চর্চায় কি ধরনের সমস্যা ছিল, কিরকম তাগিদ থেকে, কি ধরনের প্রশ্ন তুলে সেসব সমাধানের চেষ্টা হয়েছে, করতে গিয়ে কোথায় ঠেকতে হয়েছে, কোথায় ঠোক্কর খেতে হয়েছে, ফলে আবার নতুন প্রশ্ন তুলতে হয়েছে, নতুন করে পথ খুঁজে নিতে হয়েছে, কতটা নিষ্ঠা আর সাহস নিয়ে সমাজের অযৌক্তিকতা ও সমাজ-চালকদের ক্ষমতার মোকাবিলা করে এগোতে হয়েছে চিকিৎসাবিদ্যাকে - অতীতের বদলে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের যোগেও এই প্রশ্নগুলি তো কম জরুরি নয়। তাই এসবের খতিয়ান বর্তমানেও আলোর দিশারী হতে পারে।

আধিব্যাধির আদ্যকথা

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র অঘোর মাস্টারকে অনেকেরই মনে থাকার কথা। আমারও ছোটোবেলার মানসপটে ওইরকম এক যমদূতের ছবি আঁকা ছিল বহুদিন; তিনি হলেন আমাদের বাড়ির ডাক্তারবাবু বা গৃহচিকিৎসক। একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। বড়দার সঙ্গে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে গিয়ে বৃষ্টিতে হাপুস ভিজে সর্দিকাশি জ্বরভাব হয়েছিল। তার ওপর ক্লাসের এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ফেলে পুরো এক টাকার আলুকাবলি খেয়ে পেটটাও ভালো যাচ্ছিল না। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা মাস্টারমশাই পড়াতে এসে ফিরে গিয়েছেন, আমিও কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউনের রোমহর্ষক কীর্তিকলাপ গোগ্রাসে গিলছি, আর তার সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ভাজা ইলিশের স্বর্গীয় গন্ধ উপভোগ করছি, এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখা দিলেন—

না, 'দৈবদুর্যোগে অপরাহত কালো ছাতা' মাথায় অঘোর মাস্টার নয়, স্টেথোস্কোপ হাতে ডাক্তারবাবু। বেঁটেখাটো, টাকমাথা ভদ্রলোকের চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, মুখে স্থিত গাম্ভীর্য। এসেই এমন ভাবখানা দেখালেন যেন আমার কতকালের বন্ধু!

'কী রে, আবার কী পাকালি? ভেজ্ আরও বৃষ্টিতে। নে, জিভটা বের কর।' তারপর নাড়ি টিপে, বুকে নল বসিয়ে, পেট খুঁচিয়ে বললেন 'নাঃ, কিস্সু হয়নি, কালই ইস্কুল যাবি।' বলেই খস্‌খস্ করে ওষুধের ফিরিস্তি লিখলেন। ডাক্তারবাবুর ওষুধ যখন, তেতো হবে নির্ঘাত। তা হোক, কোনোরকমে খেয়ে নেব; তারপর কোন্ না দু-এক টুকরো ভাজা ইলিশের অনুপান(?) তো আছেই। কিন্তু বিধি বাম, মা যে কারুর এতবড়ো শত্রু হয় জানা ছিল না। বললেন, 'ডাক্তারবাবু: ছেলেটা তো রাক্ষসের মতো কেবলই খাই খাই করছে, কী খেতে দিই বলুন তো? বিকেলে আবার দেখলুম বার তিনেক পায়খানা ছুটেছে।'

ব্যস, আর যায় কোথা, আমার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দৈববাণী হল 'মুড়ি, সন্দেশ আর এককাপ গরম দুধ। কোথায় ভাজা ইলিশ, আর কোথায় ভিখু গোয়ালার দুধ মেশানো জল! মৃদু আপত্তি করেছিলুম; কিন্তু মা বড়ো কঠিন ঠাঁই, আর 'বিষ্ণুদূত'-এর মতোই ডাক্তারবাবুর ওপর তার অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি। সুতরাং সেদিনের সেই বর্ষামুখর রাতে ইলিশ মাছ আর বরাতে জুটল না।